

নাম: মো: ইমরান হোসাইন

জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি, ১৯৯৭

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৩ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : গার্মেন্টস শ্রমিক,

শাহাদাতের স্থান : তারাগাছ, গাজীপুর (ভাড়া বাসা)

শহীদের জীবনী

”চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেলেন জুলাই যোদ্ধা ইমরান”

ইমরান হোসেন একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু এক অসাধারণ আত্মত্যাগের প্রতীক। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার মুশলী ইউনিয়নের চপই মোহনপুর গ্রামের এক সাধাসিধে পরিবারে। পিতার নাম ইসলাম উদ্দিন। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ইমরান গাজীপুরের তারাগাছ এলাকায় বসবাস শুরু করেন স্ত্রী ও ১৮ মাস বয়সী শিশুসন্তানকে নিয়ে। জীবনের চাকা সচল রাখতে তিনি প্রায় সাত বছর ধরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে যাচ্ছিলেন। যন্ত্রের মত জীবন চালিয়ে গেলেও তাঁর হৃদয় ছিল দেশের মানুষের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিবেদিত।

যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

ইমরান হোসেন ছিলেন সেইসব সাহসী মানুষের একজন, যাঁরা ২০২৪ সালের ‘জুলাই বিপ্লব’ বা গণ-অভ্যুত্থানে নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে রাজপথে নেমেছিলেন। গত ১৮ জুলাই ২০২৪, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন, যেদিন গাজীপুরে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করছিলো ইমরান ও তাঁর সহকর্মীরা। তারা বিশ্বাস করতেন এই দেশটা তাদের, মানুষের রক্ত-ঘামে গড়া; তাই শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেদিনের সেই বিক্ষোভে অতর্কিতভাবে গুলিবর্ষণ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুলির ঝাঁকে ক্ষতবিক্ষত হয় ইমরান হোসেনের শরীর বুক, পিঠ, চোখ ও শরীরের নানা অংশে গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহযোগীরা তাঁকে দ্রুত স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের ভয়ে, হয়রানির আতঙ্কে হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই রাতের আঁধারে হাসপাতাল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর এক নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ যুদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, শরীর থেকে গুলি বের করেছেন কিন্তু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাননি কখনোই। এরপরও থেমে যাননি ইমরান। শরীরের রক্তাক্ত ক্ষত বয়ে নিয়ে প্রতিদিনের জীবিকার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। পরিবারকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন, সন্তানকে বুকুর পাশে আগলে রেখেছেন। কিন্তু যে বুক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় গর্জে উঠেছিল একদিন, সেই বুক গভীর ক্ষত ছিল; সে ক্ষত শুধু শারীরিক ছিল না, ছিল এক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। এইভাবে প্রায় এক বছর ধরে মৃত্যুকে বুক ধারণ করে তিনি বেঁচে ছিলেন। অবশেষে, দীর্ঘ সেই যন্ত্রণা আর মৃত্যুর দিকে হেলে যাওয়া দিনশেষে তিনি শহীদ হন। ১৩ জুন ২০২৫, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাজীপুরের তারাগাছ এলাকার ভাড়া বাসায় ইমরান হোসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এক বুক স্বপ্ন, এক বুক যন্ত্রণা আর এক গভীর ভালোবাসা নিয়ে তিনি চলে গেলেন এই পৃথিবী থেকে। পরদিন ভোরেই তাঁর নিখর দেহ নিয়ে আসা হয় চপই মোহনপুর গ্রামে। গ্রামজুড়ে তখন এক নীরব বিষাদ। দুপুর ২:০০ টায়, ১৪ জুন ২০২৫, পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। সেখানে কাঁদছিলেন মা-বাবা, স্ত্রী, শিশু সন্তান ও এলাকার মানুষজন যাঁরা আজও বিশ্বাস করতে পারছেন না, যে ইমরান আর কখনও বাড়ির উঠানে পা রাখবে না। শহীদ ইমরান হোসেন আমাদের জন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন; তিনি প্রতীক একজন সাহসিকতার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সাহস। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের মাটিতে এখনও এমন সন্তান জন্ম নেয়, যারা বুক গুলি নিয়েও মাথা নত করে না। ইমরানের মতো শহীদদের রক্তে যে গণতন্ত্র, যে ন্যায়ের স্বপ্ন গাঁথা আছে, তা একদিন বাস্তব হবে এই আশা নিয়েই আমরা তাঁদের গল্প বলি, স্মরণ করি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিই তাঁদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের চিহ্ন।

পরিবারের অভিমত

ইমরানের স্ত্রী রিতা আক্তার জানান, তাঁর স্বামী জুলাই যুদ্ধে আহত হলেও নিজেকে কখনো জাহির করতেন না। সবসময় বলতেন, নতুন একটা দেশ তো পেয়েছি। মাঝেমধ্যে ভীষণ অসুস্থ হয়ে

যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

ইমরান হোসেন ছিলেন সেইসব সাহসী মানুষের একজন, যাঁরা ২০২৪ সালের ‘জুলাই বিপ্লব’ বা গণ-অভ্যুত্থানে নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে রাজপথে নেমেছিলেন। গত ১৮ জুলাই ২০২৪, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন, যেদিন গাজীপুরে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করছিলো ইমরান ও তাঁর সহকর্মীরা। তারা বিশ্বাস করতেন এই দেশটা তাদের, মানুষের রক্ত-ঘামে গড়া; তাই শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেদিনের সেই বিক্ষোভে অতর্কিতভাবে গুলিবর্ষণ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুলির ঝাঁকে ক্ষতবিক্ষত হয় ইমরান হোসেনের শরীর বুক, পিঠ, চোখ ও শরীরের নানা অংশে গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহযোগীরা তাঁকে দ্রুত স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের ভয়ে, হয়রানির আতঙ্কে হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই রাতের আঁধারে হাসপাতাল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর এক নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ যুদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, শরীর থেকে গুলি বের করেছেন কিন্তু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাননি কখনোই। এরপরও থেমে যাননি ইমরান। শরীরের রক্তাক্ত ক্ষত বয়ে নিয়ে প্রতিদিনের জীবিকার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। পরিবারকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন, সন্তানকে বুকুর পাশে আগলে রেখেছেন। কিন্তু যে বুক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় গর্জে উঠেছিল একদিন, সেই বুক গভীর ক্ষত ছিল; সে ক্ষত শুধু শারীরিক ছিল না, ছিল এক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। এইভাবে প্রায় এক বছর ধরে মৃত্যুকে বুক ধারণ করে তিনি বেঁচে ছিলেন। অবশেষে, দীর্ঘ সেই যন্ত্রণা আর মৃত্যুর দিকে হেলে যাওয়া

দিনশেষে তিনি শহীদ হন। ১৩ জুন ২০২৫, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাজীপুরের তারাগাছ এলাকার ভাড়া বাসায় ইমরান হোসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এক বুক স্বপ্ন, এক বুক যন্ত্রণা আর এক গভীর ভালোবাসা নিয়ে তিনি চলে গেলেন এই পৃথিবী থেকে। পরদিন ভোরেই তাঁর নিখর দেহ নিয়ে আসা হয় চপই মোহনপুর গ্রামে। গ্রামজুড়ে তখন এক নীরব বিষাদ। দুপুর ২:০০ টায়, ১৪ জুন ২০২৫, পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। সেখানে কাঁদছিলেন মা-বাবা, স্ত্রী, শিশু সন্তান ও এলাকার মানুষজন যাঁরা আজও বিশ্বাস করতে পারছেন না, যে ইমরান আর কখনও বাড়ির উঠানে পা রাখবে না। শহীদ ইমরান হোসেন আমাদের জন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন; তিনি প্রতীক একজন সাহসিকতার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সাহস। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের মাটিতে এখনও এমন সন্তান জন্ম নেয়, যারা বুকে গুলি নিয়েও মাথা নত করে না। ইমরানের মতো শহীদদের রক্তে যে গণতন্ত্র, যে ন্যায়ের স্বপ্ন গাঁথা আছে, তা একদিন বাস্তব হবে এই আশা নিয়েই আমরা তাঁদের গল্প বলি, স্মরণ করি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিই তাঁদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের চিহ্ন।

পরিবারের অভিমত

ইমরানের স্ত্রী রিতা আক্তার জানান, তাঁর স্বামী জুলাই যুদ্ধে আহত হলেও নিজেকে কখনো জাহির করতেন না। সবসময় বলতেন, নতুন একটা দেশ তো পেয়েছি। মাঝেমধ্যে ভীষণ অসুস্থ হয়ে গেলেও কেউ কখনো খবর নেয়নি। টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করানো যায়নি। তাঁর সঙ্গে যারা আহত ও নিহত হয়েছিল, সবাই তালিকাভুক্ত হওয়া ছাড়াও সরকারের সব ধরনের অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বামীর খবর কেউ নেয়নি।

বাবা ইসলাম উদ্দিন বলেন, ‘বেহেই কইছে, আমার ছেড়া যুদ্ধ কইরা আহত অইছে। অহন সরকার খোঁজখবর নিবো, এমনকি অনেক কিছু দিবো। কিন্তু গত ১১ মাসে একটা বারের লাইগ্যাও কেউ আমার খোঁজ নিলো না। ছেড়া অসুখ লইয়া ঈদো বাড়িত আইছিল। পরদিনই চইল্যা গেছে। যাওনের সময় কইয়া গেছে, আরেকবার আইলে ঘরভা ঠিকঠাক করবো। অহন হে তো আর বাড়িত আইতো না।

ভগ্নিপতি খোকন মিয়ার ভাষা অনুযায়ী, ইমরানের শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত ছিল বুক দুটি, চোখে একটি ও অন্যান্য স্থানে আরও। কিন্তু চিকিৎসা না পেয়ে শারীরিক অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে থাকে। সে নিজের নাম তালিকায় তোলার জন্য কোথাও যেতে রাজি ছিল না। সেটা তার আত্মসম্মানের বিষয় ছিল।

বিশেষ ব্যক্তিদের অভিমত

ইমরান মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ১৪ জুন ২০২৫ শনিবার তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান সমন্বয়ক আশিকিন আলম। চিকিৎসার সব কাগজ দেখে শতভাগ নিশ্চিত, ইমরান একজন জুলাই যোদ্ধা। তালিকায় নাম না থাকলেও এখন সংশ্লিষ্ট জায়গায় আবেদন করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়জুর রহমান জানান, মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি ইমরানের বাড়িতে যান। সেখানে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পরে আহত হওয়ার সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বেশ কিছু কাগজপত্র দেখানো হয়। এতে প্রমাণ হয়, ইমরান জুলাই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

শেষ কথা

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে সকল সুযোগ সুবিধার বাইরে রয়েছে তার জুলন্ত উদাহরণ ইমরান হোসাইন। গার্মেন্টস কর্মী ইমরান হোসাইনের নাম জুলাই বিপ্লবে আহতের তালিকায় উঠেনি। পাননি কোন উন্নত চিকিৎসাও। প্রায় ১১ মাস ক্ষত নিয়ে নিজ বাসায় কষ্ট পেয়েছেন এই জুলাই যোদ্ধা। একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

পুরো নাম : ইমরান হোসাইন

বয়স : ০১/০১/১৯৯৭ (৩০ বছর)

পেশা : গার্মেন্টস শ্রমিক

স্ত্রী : রিতা আক্তার, পেশা: গৃহিণী

সন্তান : ০১ জন, বয়স: ১৮ মাস

পিতা : ইসলাম উদ্দিন

বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : জেলা: ময়মনসিংহ, উপজেলা: নান্দাইল, ইউনিয়ন: মুশলী, গ্রাম: চপই মোহনপুর

আহত : ১৮ জুলাই ২০২৪, স্থান: গাজীপুর

আক্রমণকারী : পুলিশ

আঘাতের ধরণ : শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত, বুক দুটি গুলি, ও চোখে একটি গুলি

শাহাদত : তারিখ: শুক্রবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, সময়: রাত ১২টা, তারাগাছ, গাজীপুর (ভাড়া বাসা)

জানালা : ১৪ আগস্ট ২০২৫ দুপুর ২:০০টা

দাফন : নিজ গ্রাম

প্রস্তাবনা

১. স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ

২. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান

৩. শহীদদের একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের লেখাপড়ার সকল খরচ বহন

৪. শহীদদের পিতামাতাকে এককালীন সহযোগিতা